গবেষণালব্ধ ফলাফলের সারসংক্ষেপ (২০১৪-১৫)

(ক) প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ

গবেষণার নামঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার বন্য ও গৃহপালিত পাখিতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন প্রকার বন্য ও গৃহপালিত পাখির প্রজাতিগুলোতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের প্রকারভেদ সনাক্তকরণ ও দেশের বিভিন্ন স্থানের মুরগির খামারেগুলোতে উচ্চরোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্পন্ন H5N1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এর বিপক্ষে H5N1 টিকা দেওয়া মুরগি হতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পৃথকিকরণ ও বৈশিষ্ট নিরূপন করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে H5N1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এখনো পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নরোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্পন্ন H9N2 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের উপস্থিতি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। টিকা দেওয়া খামারের মুরগি হতেও এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশে নতুন সনাক্ত করা প্রাণঘাতি H7N9 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই।

গবেষণার নামঃ পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্যে সালমোনেলা জীবাণুর প্রকোপ নির্ণয় বৈজ্ঞানিক তথ্য

পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের ৩৫৫ টি বিভিন্ন নমুনা যেমন- ক্লোয়েকাল ছোয়াব (জীবন্ত পোল্ট্রি) ১৫০ টি, বিষ্ঠা ৩০ টি, কলিজা ৩০ টি, মাংস ৩০ টি, ডিম ৫০ টি (ডিমের খোসা ৫০ টি ও আভ্যন্তরীণ অংশ ৫০টি) ও কসাই খানা হতে প্রাপ্ত ছোয়াব ১৫ টি নমুনায় সালমোনেলা জীবাণুর প্রকোপ নির্ণয় করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলে, সর্বোপরি ২৫.৩৫% নমুনায় সালমোনেলা জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে বিষ্ঠায় ৩৬.৬৬%, ক্লোয়েকাল ছোয়াব (জীবন্ত পোল্ট্রি) ৩২%, ডিমের খোসায় ২৮%, কলিজায় ২৩.৩৩%, মাংসে ২০% এবং মুরগি জবাই এর স্থান হতে প্রাপ্ত ছোয়াবে ২৬.৬৬%। এই পরীক্ষায় সংগৃহীত ডিমের আভ্যন্তরীণ অংশে কোন সালমেনেলা জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নাই। পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্য সব শ্রেণীর মানুষের আমিষের চাহিদার অনেকাংশেই যোগান দিয়ে আসছে। সুতরাং পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্যে সালমোনেলা জীবাণুর উপস্থিতি জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সালমোনেলা জীবাণুর প্রকোপ হতে রক্ষার জন্য পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রিজাত দ্রব্যের উৎস সকল পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও খামারের মানসম্মত জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গবেষণার নামঃ পলিক্লোনাল এন্টিবডি ভিত্তিক পিপিআর ভাইরাস সনাক্তকরণ পদ্ধতি

মাঠ পর্যায়ে পিপিআর রোগের ভাইরাস দ্রুত সনাক্তকরনের জন্য প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই কর্তৃক পলিক্লোনাল এন্টিবডি নির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পিপিআর সন্দেহভাজন প্রাণীর নাক ও চোখের শ্লেষা এবং মল হতে পিপিআর ভাইরাস সনাক্তকরণ করা যায় । পলিক্লোনাল এন্টিবডি নির্ভর প্রযুক্তিতে পলিস্টেরিন ইলাইজা প্লেটের পরিবর্তে কাঁচের স্লাইড ব্যবহার করে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিটে পিপিআর ভাইরাস সনাক্ত করা সম্ভব হয়। পরিশেষে বলা যায়, পলিক্লোনাল এন্টিবডি নির্ভর পিপিআর ভাইরাস সনাক্তকরণ পদ্ধতিটি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত, সহজে ও কম খরচে পিপিআর রোগ সনাক্তকরণে উপযোগী প্রযুক্তি যা বাংলাদেশে পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার নামঃ পিপিআর রোগ দমনে "বিএলআরআই মডেল"

এই মডেল প্রকল্পের গবেষণা কাজ মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার পৌলি ও চামটা গ্রামে এবং যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার মিশ্রিদিয়াড়া, মধুখালী ও বহিরামপুর নামক ৫টি গ্রামে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীদের পিপিআর বিষয়ে সচেতনার জন্য মিটিং, খামার পরিদর্শণ, পোস্টার এবং লিফলেট বিতরন করা হয়েছিল। প্রাথমিক সেরো-সারভিলেন্সের পর দুই মাস এবং এর উপরের বয়সী প্রায় পাঁচ হাজার ছাগলকে পিপিআর টিকা প্রদান করা হয়েছিল। পনের মাস পরে টিকা প্রদানকৃত তিনটি গ্রামের ছাগলে গড় রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল ৯০%। টিকা না প্রদান করার দরুণ বহিরামপুর গ্রামে পিপিআর রোগে আক্রান্ত ছাগলের ৭০% মারা গিয়েছিল কিন্তু টিকা প্রদানকৃত তিনটি গ্রামের ছাগল টিকা প্রদানের ১৫ মাস পরও পিপিআর রোগ মুক্ত ছিল। ছাগলের বাচ্চার সংখ্যা টিকা প্রদানকৃত গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯২.৪% এবং টিকা প্রদান ছাড়া গ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৭.৭৫%। দুই মাস বয়সের পর হতে সকল বাচ্চাকে স্থানীয় ভাবে প্রস্তুতকৃত পিপিআর টিকা সঠিকভাবে প্রদান করলে ছাগলে পর্যাপ্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয়, ফলে ছাগল পিপিআর রোগ মুক্ত থাকে। উদ্ভাবিত পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল দেশব্যাপী প্রয়োগের ফলে ছাগল ও ভেড়ার উৎপাদন জাতীয়ভাবে বাড়তে পারে এবং কৃষকদের দরিদ্রতা দূর করতে পারে।

(খ) পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

গবেষণার নামঃ দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আবদ্ধ অবস্থায় এবং পরিকল্পিত প্রজননের মাধ্যমে দেশী মুরগির উৎপাদন বৃদ্ধি, ডিমের ওজন বৃদ্ধি ও দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, দেশী মুরগির প্রথম ডিম পাড়ার বয়স কমেছে। গলাছিলা মুরগি বছরে গড়ে ১৮৬টি ডিম দেয় । হিলি মুরগির দৈহিক ওজন ৮ সপ্তাহে ৬০০-৭০০ গ্রাম হচ্ছে। খামারীরা গলাছিলা মুরগি ডিম উৎপাদনের জন্য এবং হিলি মুরগি মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করে লাভবান হতে পারবেন।

গবেষণার নামঃকোয়েল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

বর্তমানে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাংস উৎপাদনকারী কোয়েল উদ্ভাবনের জন্য চার ধরণের কোয়েল (জাপানীজ, ব্রাউন, বিবি হোয়াইট, বিবি ব্লাক) এর পাঁচ জেনারেশন পর্যন্ত আন্তঃপ্রজনন করা হবে। বিবি হোয়াইট এবং বিবি ব্ল্যাক কোয়েলের দৈহিক ওজন অন্যান্য দুই ধরণের কোয়েলের চেয়ে ভাল। সিলেকটিভ ব্রীডিং এর মাধ্যমে বিবি হোয়াইট ও বিবি ব্ল্যাক কোয়েলের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং মাংস উৎপাদনকারী কোয়েল হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। বিবি হোয়াইট এবং বিবি ব্ল্যাক কোয়েল সংকরায়নের মাধ্যমে মাংস উৎপাদনকারী কোয়েল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

গবেষণার নামঃ বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুরগীর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য ভিটামিন মিনারেল সমূহ দিয়ে প্রিমিক্সের উন্নয়ন

বাংলাদেশ পোল্ট্রি উৎপাদনে প্রতি বছর প্রায় ৪০০০ মেট্রিক টন ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স আমদানি করে থাকে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। উদ্ভাবিত ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স (DVMP) এর প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ ও আমদানিকৃত ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্সের পঁচিশ শতাংশ ব্রয়লার মুরগির খাদ্যে ব্যবহার করে ৫ সপ্তাহে দৈহিক ওজন ২১৪৫ গ্রাম/ব্রয়লার ও খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ১.৫১ : ১ পাওয়া গেছে। গবেষণার এ পর্যায়ে উদ্ভাবিত DVMP বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা গেলে বহির্বিশ্ব থেকে এটি আমদানি শতকরা ৭৫ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব।

গবেষণার নামঃ পোল্ট্রি খাদ্য, মাংশ ও ডিমে হেভী মেটাল নির্ণয়

পোল্ট্রি খাদ্য, ডিম ও মুরগির মাংসে হেভী মেটালস (যেমন- ক্রোমিয়াম, লেড ও আর্সেনিক) এর উপস্থিতি জানার জন্য দেশের পোল্ট্রি বহুল অঞ্চল থেকে পোল্ট্রি খাদ্য, ডিম ও মাংসের ৩৬০টি নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণায় প্রায় সবগুলি নমুনাতেই উক্ত উপাদানগুলির উপস্থিতি পাওয়া গেলেও তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম পরিমানে উপস্থিত ছিল। বিশ্লেষণকৃত লেয়ার ও ব্রয়লার রেডী ফিড সমূহ উক্ত উপাদানগুলির জন্য নিরাপদ ছিল। তবে, খোলা খাদ্যের (Loose feed) ক্ষেত্রে ১৪% এবং ১১% নমুনায় ক্রোমিয়াম ও লেড অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে যথাক্রমে ৭-৭০ ও ৩ গুন বেশী পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষাকৃত ডিমের নমুনাতে ক্ষতিকর মাত্রার ক্রোমিয়াম ও লেড পাওয়া যায়নি। তবে, ব্রয়লার মাংসের ১৪% নমুনায় অনুমোদিত মাত্রার কিঞ্চিৎ (slightly) বেশী ক্রোমিয়াম ও ২গুন বেশী আর্সেনিক পাওয়া গেছে এবং বয়স্ক ডিমপাড়া মুরগীর (Spent hen) মাংসের ৫০% নমুনাতে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ৪-৬ গুন বেশী ক্রোমিয়াম পাওয়া গেছে। উক্ত গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে, পোল্ট্রি খামারীগণকে স্বনামধন্য কোম্পানীর রেডী ফিড ব্যবহার করা এবং বাজারের খোলা খাদ্য ব্যবহার না করার জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

গবেষণার নামঃখামারী পর্যায়ে বিএলআরআই লেয়ার-২ (স্বর্ণা) এর লেয়িং পারফরমেন্স

পোল্ট্রি খামারীদের চাহিদা এবং বাজারজাতকরণে সুবিধার জন্য BLRI অটোসেক্সিং সুবিধাযুক্ত বাদামী রং এর ডিম উৎপাদনকারী BLRI লেয়ার-২ বা “স্বর্ণা” নামের আরেকটি লেয়ার স্ট্রেইন উদ্ভাবন করেছে। গবেষণা খামারে আশানুরূপ ফলাফল প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে উক্ত মুরগীর খামারী পর্যায়ে (On-Farm) উৎপাদনশীলতা যাচাই এর লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৩ টি এলাকায় (সরিষাবাড়ী, জামালপুর; কালিহাতি, টাঙ্গাইল এবং বাবুগঞ্জ, বরিশাল) ১ দিন বয়স থেকে ৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত ফিল্ড ট্রায়াল দেয়া হয়। ফিল্ড ট্রায়ালে উক্ত স্ট্রেইনটির অটোসেক্সিং হার- ১০০% পাওয়া যায় এবং প্রথম ডিম দেয়ার বয়স (Age at 1st egg) ১৩৫ দিন; ২০ ও ৭০ সপ্তাহে দৈহিক ওজন যথাক্রমে ১৫৩০ ও ১৯৫০ গ্রাম/মুরগী; ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত গড় খাদ্য গ্রহন ৭.৮ কেজি/মুরগি; বাৎসরিক ডিম উৎপাদন- ২৮০ টি/মুরগি; মোট ডিমের ওজন- ১৮ কেজি/মুরগি/বছর; ডিমপাড়া অবস্থায় গড় খাদ্য গ্রহন ১১৮ গ্রাম/মুরগি/দিন; ৭২ সপ্তাহে ডিমের ওজন ৭০ গ্রাম; খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা (FCR)-১:২.৩২ এবং মৃত্যু হার- ৩% (ডিমপাড়াকালীন) পাওয়া যায়। উক্ত ফিল্ড ট্রায়ালের গবেষণা ফলাফল থেকে অটোসেক্সিং; বাৎসরিক ডিম উৎপাদন; খাদ্য গ্রহন; ডিমের ওজন; FCR ও মৃত্যু হার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে “স্বর্ণা”-কে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পালনের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

গবেষণার নামঃদেশী জাতের হাঁসের সংরক্ষণ ও উন্নতিকরণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইস্টিটিউটে দুই ধরনের দেশী হাঁসের (রুপালী এবং নাগেশ্বরী) বাছাই এর মাধ্যমে ডিমপাড়া বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নয়নের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক রুপালী ও নাগেশ্বরী হাঁসের দৈহিক ওজন যথাক্রমে ১৫৫০ ও ১৪৪০ গ্রাম। দৈনিক খাদ্য গ্রহন প্রতি হাঁস/দিন ১৪০ গ্রাম। রুপালী হাঁস ২১ ও নাগেশ্বরী হাঁস ২২ সপ্তাহ

বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে। কিন্তু বাৎসরিক ডিম উৎপাদনের হার দু'টি জাতের মধ্যে প্রায় সমান (২১৫-২২৫) টি। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, রুপালী ও নাগেশ্বরী হাঁসের ডিমের ওজন যথাক্রমে ৬৬ ও ৬৩ গ্রাম।

গবেষণার নামঃডিম পাড়া মুরগীর স্ট্রেইন, তাপমাত্রা এবং স্ট্রেইন x তাপমাত্রার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা, শরীরবৃত্তীয় ও ডিমের গুণগুণের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের বিদ্যমান আবহাওয়ায় বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ডিম পাড়া মুরগীর ষ্ট্রেইনের উৎপাদন দক্ষতা অন্যান্য বাণিজ্যিক মুরগীর সঙ্গে তুলনীয় কিনা, তা এই গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় বাণিজ্যিকভাবে পালিত মুরগীর সাথে স্বর্ণার ডিম উৎপাদনের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায়নি। তবে, স্বর্ণা মুরগীর ডিম আকারে বড় এবং ওজনে বাণিজ্যিক মুরগীর তুলনায় ৫ গ্রাম বেশী পাওয়া গেছে, ফলে egg mass উৎপাদন ২ গ্রাম বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, উচ্চ তাপমাত্রায় (৩০-৩২° সে:) স্বর্ণা ও শুভ্রা মুরগীর তুলনায় বাণিজ্যিক মুরগীর ডিম উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে (৫%) হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, মুরগীর ডিমের গুনাগুন, রক্তে ফসফরাস ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাণিজ্যিক মুরগীর তুলনায় বেশী ছিল। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, স্বর্ণা ও শুভ্রা মুরগীর উৎপাদন দক্ষতা বাণিজ্যিক মুরগীর সঙ্গে তুলনীয় এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আবহাওয়া উপযোগী।

(গ) গবেষণা ফার্ম

গবেষণার নাম: মুন্সিগঞ্জ গরুর জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

সংকরায়ণের ফলে মুন্সিগঞ্জ গরুর জাতের অস্থিত্ব বিলিন হওয়ার পথে। তাই সম্ভাবনাময় এই জাতটি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিএলআরআইতে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিএলআরআইতে ১০টি মুন্সিগঞ্জ গাভী এবং ২টি ষাঁড় এর মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস হার্ড গঠন করা হয়েছে। নিউক্লিয়াস হার্ডের গাভীর দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৪.৫ লিঃ এবং দুধের চর্বির পরিমাণ ৫.৬১%, ল্যাকটোজ এর পরিমাণ ৬.১৯% এবং চর্বি বিহীন শুস্ক পদার্থ ১১.৪৩% যা অন্যান্য দেশী গাভীর তুলনায় বেশী। গাভীগুলি প্রতি বৎসর বাচ্চা দেয়; জীবনে ১২-১৫টি বাচ্চা দেয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং একজন খামারী সহজেই লালন-পালন করতে পারেন। সুতরাং, মুন্সিগঞ্জ গরুর জাতটি তার উৎপত্তিস্থান এবং অন্যত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

(ঘ) বায়োটেকনোলজি বিভাগ

গবেষণার নাম: ফিডমাষ্টার এ্যানড্রয়েড এ্যাপিস্নকেশন (থাম্বরুল ভার্সন) উদ্ভাবন *ডেভেলপমেন্ট অফ* ফিডমাষ্টার এ্যানড্রয়েড এ্যাপিস্নকেশন (থাম্বরুল ভার্সন)

অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক মহিষ পালনের জন্য দেহের পুষ্টির চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমান নিরম্নপণ করে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করা অতিব গুরম্নত্বপূর্ণ। কিমত্মু এদেশের মহিষ খামারীদের মহিষের দেহের পুষ্টির চাহিদার পারিমাণ নিরম্নপন করা, চাহিদা অনুসারে খাদ্য সরবরাহ করা এবং ঘাসজাতীয় খাদ্য চাষের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা কষ্টসাধ্য কাজ, কারণ উক্ত বিষয়ে তাঁদের সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে 'ফিডমাষ্টার এ্যানড্রয়েড এ্যাপিস্নকেশন' তৈরী করা হয়েছে। এটি একটি মোবাইল এ্যাপিস্নকেশন যা অতিঅল্প সময়ে মহিষের বয়স, লিঙ্গ এবং উৎপাদন অবস্থার উপর ভিত্তি করে থামরম্নল অনুসারে মহিষের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য দানাদার খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। একই সাথে প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের পরিমান নিরম্নপণ এবং বাৎসরিক ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে খামারীদের ঘাস চাষের দিক নির্দেশনা দিতে পারে। এছাড়া, মহিষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওজনের উপর ভিত্তি করে ঔষধের মাত্রা নির্ণয়ে ভেটেরেনারিয়ান গণদের সহযোগিতা করতে পারে।

গবেষণার নাম : গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রুণ গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গরুর বাছুর উৎপাদন

গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন এবং গাভীর জরায়ুতে তা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল জাতের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুধ ও মাংসের যোগান দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অধিক উৎপাদনশীল গাভী থেকে বছরে নূন্যতম ২০-২৫ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে তাদের নিজ নিজ দেশে গো-সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে দেশীয় গো-সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিগত ২০১১ সাল থেকে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং ইতোমধ্যে কসাইখানা হতে সংগৃহীত ডিম্বাণু থেকে গবেষণাগারে ভ্রুণ উৎপাদন কৌশল রপ্ত করেছে। বিগত অর্থ বছরে গবেষণাগারে উৎপাদিত ভ্রুণ গাভীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করার মধ্যমে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ইতোমধ্যে একটি গাভীর গর্ভধারণ (গর্ভ ধারণ হার ২০%) নিশ্চিত হয়েছে এবং সম্ভাব্য বাচ্চা প্রদানের তারিখ হচ্ছে ২০১৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ। প্রযুক্তিটি সফলতার সাথে ব্যবহার করতে পারলে, স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

(ঙ) প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

গবেষণার নাম: দেশী গরুর সাথে সংকরায়েনর জন্য বৈদেশিক মাংশল জাতের গরুর নির্বাচন এবং উৎপন্ন সংকরায়নসমূহের উৎপাদন দক্ষতা মূল্যায়ন

দেশে গো-মাংশের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রানীজ আমিষের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রাহমানসহ শ্যারোলেইস, সিমেন্টাল এবং লিমোসিনের বীর্য দ্বারা দেশী উন্নত গাভী যেমন- বিএলআরআই ক্যাটল ব্রিড-১ (বিসিবি-১) প্রজনন করে তা থেকে উৎপাদিত ক্রসব্রেড সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা মূল্যায়নপূর্বক বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী এবং দুই বৎসর বয়সে ৩০০ কেজি লাইভ ওজন সমৃদ্ধ একটি ব্রীফ ক্যাটল তৈরীর গবেষণা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় এখন পর্যন্ত মোট ১৩৬ ডোজের বীর্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে তার গুণগত মান পরীক্ষা এবং সংরক্ষণপূর্বক মোট ৫১ টি কৃত্রিম প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ২৮টি বিসিবি-১ গাভী এবং বকনা গর্ভধারণ করেছে। অতি সম্প্রতি চারটি ক্রসব্রেড প্রোজেনীর জন্ম হয়েছে যার মধ্যে লিমোসিনের দুটি, শ্যারোলেইসের একটি এবং সিমেন্টালের একটি বাচ্চা রয়েছে।

গবেষণার নাম:আরসিস গরুর দুধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী ক্যানডিডেড জীনসমূহের উপর গবেষণা

দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে অধিক ও গুণগতমান সম্পন্ন দুধ উৎপাদন গাভীর একটি গরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গাভীর দুটি প্রজন্মের মাঝে অধিক সময়ের ব্যবধান, দুধ উৎপাদন বৈশিষ্ট্যগুলো শুধুমাত্র গাভীতে দৃশ্যমান, খামারী পর্যায়ে গুণগতমান সম্পন্ন ষাঁড় তৈরীতে অধিক সময় ও অর্থ এই শিল্প দ্রুত বিকাশের অন্তরায়। এই অন্তরায়সমূহ দূরীকরণ করে জন্মকালীন সময়ে অতি দ্রুততার সাথে উন্নত কৌলিকমান সম্পন্ন বাছুর যাচাই-বাছাইয়ের একটি জেনেটিক মার্কার তৈরী করার নিমিত্তে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আরসিসি ক্যাটেলের উপর একটি গবেষণা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে মোট ৫৫টি আরসিসি গরুতে তিনটি উল্লেখযোগ্য দুধ উৎপাদনকারী জ্বীনের মোট ১৮ সেট প্রাইমার নিয়ে জেনেটিক মার্কার তৈরীর কাজটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গবেষণার নাম: গো খাদ্য হিসেবে প্রাপ্ত বিভিন্ন ঘাস এবং সাজনা ঘাসের তুলনামূলক খাদ্যপুষ্টি মূল্যায়ন গবেষণা

গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু, সাজনা এবং ভূট্রা ঘাসের তুলনামূলক উৎপাদন ক্ষমতা, পুষ্টিমান এবং গবাদিপশুর উৎপাদন দক্ষতার উপর গবেষণা করা হয়। গবেষণার অধীনে ১০৪.০ কেজি গড় ওজনের মোট ১৮ টি বাড়ন্ত ষাড় গরুকে তিনটি গ্রুপে সমানভাবে ভাগ করা হয়। উক্ত তিন গ্রুপের মধ্যে; কন্ট্রোল গ্রুপের গরুকে শুধুমাত্র ভূট্টা (বিএডিসি হাইব্রিড) এবং অপর দু'গ্রুপের গরুকে শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু জাতে ঘাস এবং সাজনা ঘাস সরবরাহ করা হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, সাজনা ঘাস গ্রহনকারী গরুর দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির হার (৩৭৬ গ্রাম) এবং খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা (৮.৮৫) যথাক্রমে ভুট্টা ঘাস (দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির হার ২৮৯ গ্রাম ও খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা ১১.৫২) এবং অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু (দৈনিক দৈহিক বৃদ্ধির হার ২১৮ গ্রাম ও খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা ১৩.০৮) ঘাস গ্রহনকারী ষাঁড় গরুর চেয়ে ভালো। শুধু তাই নয় মাংস উৎপাদনের সাথে জড়িত আর্থিক বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ পূর্বক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সাজনা ঘাস, ভূট্টা ঘাসের চেয়ে অধিকতর ভালো এবং ভুট্রা ঘাস, অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বুর চেয়ে ভালো। উল্লেখিত গবেষণা ফলাফল থেকে খামারীরা সহজেই গবাদিপশুর জন্য লাভজনক এবং মূল্যসাশ্রয়ী রেশন তৈরির জন্য উপযোগী ঘাস নির্বাচন করতে পারবেন।

গবেষণার নাম: জৈব, বাহ্যিক এবং পরিসংখাযানিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষেণর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের ঘাসের উপযোগীতার ক্রম বিন্যাস্তকরণ

গো-খাদ্যে হিসেবে এদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঘাস এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ঘাসের খাদ্যমান ও অর্থনৈতিক উপযোগীতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার ঘাসের বার্ষিক মোট উৎপাদন ক্ষমতা, ঘাস ব্যবহারে প্রাণির উৎপাদন দক্ষতা, ঘাস উৎপাদন খরচ, খাদ্য খরচ অর্থাৎ লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ এবং প্রাণির আন্ত্রিক মিথেন উৎপাদনের মাধ্যমে শক্তি অপচয় অর্থ্যৎ ঘাসের জৈব, বাহ্যিক এবং পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক সাশ্রয়ী মূল্যে মাংস ও দুধের উৎপাদন দক্ষতা সহায়ক ঘাস চিহ্নিতকরণ বা ঘাসের উপযোগীতাক্রম বিন্যস্তকরণের জন্য মেইজ ইনডেক্স উদ্ভাবন করা হয়েছে। মেইজ বা ভূট্টা ঘাস সারা বিশ্বে গবাদিপশুর জন্য উৎকৃষ্ট এবং একটি আদর্শ আঁশ খাবার (Roughage) হিসেবে স্বীকৃত বিধায় গবেষণায় মেইজ বা ভূট্টার পুষ্টিসহগ (Nutrient coefficient) এক (১) ধরে অন্যান্য ঘাসের পুষ্টিসহগ নির্ণয় করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, লোকাল ঘাস, খড় (আমন), খড় (আউস), ইউরিয়া চিটাগুঁড় মিশ্রিত খড় (ইউএমএস), ভূট্টা স্টোভার (মেইজ স্টোভার), প্লিকাটুলুম, এড্রোপোগান এবং স্প্লেনডিডা ঘাসের পুষ্টিসহগ ০.২৫ থেকে ০.৪১ এর মধ্যে; বিভিন্ন ধরণের নেপিয়ার ঘাস যেমন নেপিয়ার এরোসা এর পুষ্টিসহগ ০.৫৭, নেপিয়ার বাজরা ০.৭০ এবং নেপিয়ারা হাইব্রিড ০.৯৪। এছাড়াও জাম্বু ঘাসের বিভিন্ন ভ্যারাইটির পুষ্টিসহগ যথাক্রমে সুগারগ্রেস জাম্বু-০.৪৫ এবং অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু-০.৯৮। অন্যদিকে গবেষণায় প্রাপ্ত সাজনা ঘাসের পুষ্টিসহগ ভূট্টাঘাসের তুলনা অনেক বেশী অর্থাৎ সাজনা ঘাসের পুষ্টিসহগ ছিল ১.৬৪। উদ্ভাবিত ''মেইজ ইনডেক্স'' বা ''ফডার র‌্যাকিং টুল'' ব্যবহার করে খামারীরা গবাদিপশুর জন্য মূল্যসাশ্রয়ী রেশন তৈরির পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়াও উল্লেখিত ''মেইজ ইনডেক্স'' ফডার বীজ

প্রত্যয়নকারী সংসহা, বীজ আমদানীকারক এবং সর্বোপরি সম্প্রসারণকর্মীরা ব্যবহার করে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

গবেষণার নাম : দেশীয় বাড়ন্ত গরুকে বিভিন্ন পুষ্টিগুণাগুন সম্পন্ন সাইলেজ খাদ্যের সাথে বিভিন্ন মাত্রার দানাদার খাদ্যের সরবরাহের ফলে মাংস উৎপাদনের প্রভাব নির্ণয়

লাভজনক ও মূল্যসাশ্রয়ী মাংস উৎপাদন দক্ষতা নিরুপণের জন্য আঁশজাতীয় খাদ্যের সাথে দানাদার খাদ্যের অনকুল মাত্রা (Optimum concentrate level) নির্ণয় করা আবশ্যক। বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে উল্লেখিত গবেষণায় দু'ধরণের আঁশ খাদ্য যথা ভূট্টা এবং অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু সাইলেজের সাথে দানাদার খাদ্যের চারটি (৪) ভিন্ন মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত আঁশ এবং দানাদার খাদ্যের অনুপাত (শুস্ক পদার্থের ভিত্তিতে) ছিল যথাক্রমে ১০০:০০, ৭৫:২৫, ৫০:৫০ এবং ২৫:৭৫। খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা ও খরচ উভয় বিবেচনায় গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, গরু মোটাতাজাকরণে সাইলেজ বা ঘাস হিসেবে 'ভূট্টা' ব্যবহার, 'অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু' ব্যবহারের চেয়ে অধিক মূল্যে-সাশ্রয়ী ও লাভজনক। ভূট্টা ও দানাদার মিশ্রণ অনুপাত ৫০:৫০ একং অস্ট্রেলিয়ান সুইট জাম্বু ও দানাদার মিশ্রণ অনুপাত ৭৫:২৫ অধিকতর লাভজনক। সর্বোপরি, গবেষণা লব্ধ ফলাফল ব্যবহার করে গরু মোটাতাজকরণ ব্যবসায় জড়িত খামারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

গবেষণার নাম t পাইকারী বাজারের অপচিত সবজী থেকে গোখাদ্য তৈরী

পাইকারী বাজারে সবজীর মোট সরবরাহের ০.৩% অপচয় হয় । বাজার থেকে এসব সবজী সংগ্রহ করে গরুর খাদ্য তৈরী করা যায়। এসব সবজী থেকে ময়লা ও নষ্ট অংশগুলো বেছে ফেলে দিতে হবে ১০০ কেজি সবজী পানিতে ধুয়ে হাতে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে যতদূর সম্ভব ভেঙ্গে ছোট করতে হবে এবং সাথে সাথে ২-২.৫ কেজি কুড়া ও ২ কেজি লবন ভালভাবে মিশিয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে। এভাবে উৎপাদিত খাবারের পুষ্টিমান গমের ভূষির সমতুল্য। উক্ত খাবার দানাদার খাবারের সাথে ২০ থেকে ৩০ % হারে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যায়। একজন উদ্যোক্তা দৈনিক ১.৫ টন সবজী থেকে প্রায় ২২৫ কেজি খাদ্য তৈরী করতে পারে যার উৎপাদন খরচ প্রায় ৫৮৫০ টাকা এবং বাজার মুল্য প্রায় ৬৭৫০ - ৭৮৭৫ টাকা। এভাবে একজন উদ্যোক্তা দৈনিক ৯০০– ২০২৫ টাকা আয় করতে পারে।

গবেষণার নাম t গো খাদ্য হিসেবে সাজনা গাছের ব্যবহার এবং কৃষিতাত্তিক বৈশিষ্ট্যাবলির অনুসন্ধান

বাংলাদেশকে দুধে- মাংসে স্বয়ংসম্পর্ণ করতে হলে অবশ্যই পশুর প্রোয়জনীয় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাদ্য যোগান দিতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, *Moringa oleifera* অথবা সাজনা গাছে (প্রোটিন:এ.ডি.এফ; ১:২.০ থেকে ২.৫) উচ্চমানের পুষ্টি বিদ্যমান থাকায় রোমন্থক প্রাণীর উৎপাদন অনুযায়ী পুষ্টি চাহিদা অনেকআংশেই পূরণ করতে পারে। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাজনা গাছ সবজী হিসাবে খাওয়ার জন্য বাড়ির আশপাশ এবং রাস্তার পাশে লাগিয়ে থাকে যা গো-খাদ্য হিসেবে সারা বৎসর সরবরাহ করা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। এক্ষেত্রে খামারী পর্যায়ে গো-খাদ্য হিসেবে বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করা প্রয়োজন। এছাড়া সাজনা চাষের উপর গবেষণা করে দেখেছে যে, কালো বীজের সাজনা গাছ মার্চ- এপ্রিল মাসে ২৫০০০০ চারা প্রতি হেক্টর জমিতে লাগালে এবং মাটি থেকে ৪০ সেমি উপর থেকে বছরে ছয় (৬) বার কাটলে ৪০ টন শুকনা সাজনা ফডার পাওয়া যায় যাতে ১৭-১৮% আমিষ, প্রতি কেজিতে ৯.৫ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি এবং ৭৪% পরিপাক যোগ্য জৈব্য পদার্থ থাকে, যার মাধ্যমে অধিক মাংস ও দুধ উৎপাদন সম্ভব।

গবেষণার নাম t বাংলাদেশে প্রাণীজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের উপর তার প্রভাব

প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে প্রাণীজ বর্জ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একজন খামারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ লাঘবে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশে খামারী কর্তৃক ব্যবহৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মাধ্যম চারটি - একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংরক্ষণ ও প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার, শুকনো জ্বালানী, তরল বর্জ্যের ব্যবহার ও বায়োগ্যাস যার অধীনে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত বর্জ্যের ৭৫.২, ১৮.৩৫, ১.৬৫ ও ৪.৮০ শতাংশ বিদ্যমান এবং উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা মাধ্যম গুলো থেকে প্রতিবছর প্রাণী প্রতি ৫.৬৪৫, ৭.৬২, ৪.৯৭৮ এবং ০.৫৬ কেজি হারে মোট ১৫০.০৮ গ্যাগা মিথেন পরিবেশে নির্গত হচ্ছে, যা মানুষ তথা জীব বৈচিত্রের জন্য অত্যন্ত হুমকি স্বরূপ। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাণীজ বর্জ্য থেকে জৈব জ্বালানী, জৈব বিদ্যুৎ , অধিকতর গুনগতমান সম্পন্ন জৈব সার এমন কি জৈব সি.এন.জি ও উৎপাদন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে খামারী নিজে যেমন উন্নত জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সেবা উপভোগ করতে পারবে তেমনি এই উন্নত সেবা সরবরাহের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের দ্বার ও উন্মোচন করতে পারবে অর্থাৎ সঠিক ও সুষ্ঠু প্রাণীজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারীর অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। একই সাথে আমাদের দেশের মাটির একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা জৈব উপাদানের ঘাটতি সমাধানে জৈব সারের ভূমিকা অপরিসীম।

গবেষণার নামঃ ভেড়া ও ভেড়ার পারফরমেন্সের উপর প্রি এবং পোস্ট নাটাল নিউট্রিশনের প্রভাব

দেশি ভেড়া হতে লাভজনক মাংস উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় গুলো হলো কম ওজনের বাচ্চা, মায়ের স্বল্প দুধ উৎপাদন ও বাচ্চার স্বল্প ওজন বৃদ্ধির হার। উক্ত গবেষণায় দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালিত গর্ভবতী দেশি ভেড়ীকে বাচ্চা দেয়ার ৬-৭ সপ্তাহ পূর্ব

হতে দুধ উৎপাদন কালীন সময় পর্যন্ত পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস ও ভেড়ীর ওজনের ১.৫% হারে দানাদার খাবার (ভূট্রা ভাঙ্গা ৪০ ভাগ, সয়াবিন মিল ২৬ ভাগ, গমের ভূষি ২২ ভাগ, চালের কূড়া ১০ ভাগ, লবণ ১ ভাগ, ভিটামিন মিনারেন প্রিমিক্স ০.৫ ভাগ ও ডিসিপি ০.৫ ভাগ) দিলে বাচ্চার জন্ম ওজন (২.৩১ কেজি), ভেড়ীর দুধ উৎপাদন (৬১২ গ্রাম/দিন) ও বাচ্চার দৈনিক ওজন বৃদ্ধির হার (১২৪ গ্রাম/দিন, দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত) অনেক বেশি হয়। এই ক্ষেত্রে বাচ্চার জন্মের ২-৩ সপ্তাহ বয়স হতে দৈনিক ২০ গ্রাম হারে দানাদার খাবার (ভূট্রা ভাঙ্গা ৬৮ ভাগ, সয়াবিন মিল ২৬ ভাগ, লবণ ১ ভাগ ও ভিটামিন মিনারেন প্রিমিক্স ১ ভাগ) সরবরাহ করতে হবে। বাচ্চার দানাদার খাবার দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত পরবর্তী প্রতি সপ্তাহে ১০ গ্রাম হারে বাড়াতে হবে। এই খাদ্য ব্যবস্থাপনা কম বয়সে অধিক ওজনের ভেড়া উৎপাদনে সাহায্য করে।

গবেষণা শিরোণাম: ভেড়ার বাচ্চার উৎপাদন দক্ষতার উপর খড়ের সাথে দানাদার খাদ্যের পরিবর্তে সাজনা পাতা ব্যবহারের প্রভাব

দেশি ভেড়া মোটাতাজাকরণে সাধারনত আমাদের দেশে ঘাস বা খড় জাতীয় খাদ্যের সাথে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। কিন্তু প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র খামারীদের পক্ষে উচ্চমূল্যে এই দানাদার খাদ্য ব্যবহার এবং এর প্রাপ্যতা নিশ্চত করা খুবই দূরহ। উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে, চিটাগুড় মিশ্রিত খড় নির্ভর খাদ্যের সাথে সাজনা ফলিয়েজের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রচলিত দানাদার খাদ্যকে যথাক্রমে ২৫, ৫০, ৭৫ এবং ১০০ শতাংশ প্রতিস্থাপন করে শুকনো সাজনা ফলিয়েজ ব্যবহার করলে দৈনিক যথাক্রমে ১২৯.৫০, ১২৯.৮৩, ১২৪.৩৩ এবং ১১৮.১৭ গ্রাম করে বাড়ন্ত ভেড়ার ওজন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও প্রতি কেজি মাংস উৎপাদনে কৃষক যথাক্রমে ১১৭.৯৯, ১২৯.৪১, ১২৬.৮৫ এবং ১৬৩.০৯ টাকা লাভবান হতে পারেন।

(চ) ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

গবেষণার নামঃ নাইক্ষ্যংছড়ির পাহাড়ি এলাকায় সমাজ ভিত্তিক ভেড়া উৎপাদন

বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় সাধারণত কোন ভেড়া পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে মোট পার্বত্য এলাকার প্রায় ৬৬% ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে গো-খাদ্য উৎস যেমন: প্রাকৃতিক ঘাস, গাছের পাতা, লতা, গুল্ম প্রভৃতি রয়েছে যা পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া লালন পালনের জন্য খুবই উপযোগী। এসব পাহাড়ী অঞ্চলের বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। পাহাড়ী এলাকায় প্রাকৃতিক ঘাস, গাছের পাতা এবং প্রচুর পরিমাণে পতিত জমি রয়েছে। পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া পালনের উপযোগী আবহাওয়া হওয়ায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের আওতায় পার্বত্য এলাকায় খামারী পর্যায়ে ভেড়া লালন পালন করার একটি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহন করে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১ম বছর প্রায় ১১জন খামারীকে ৫টি করে ভেড়া (৪টি ভেড়ী ও ১টি ভেড়া) সরবরাহ করা হয়। এই গবেষণার মাধ্যমে উক্ত এলাকার পালনরত ভেড়ার বিভিন বৈশিষ্ট্যের উৎপাদনগত পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, গবেষণা ফার্মের বাচ্চা জন্ম ওজন (১.৩৪ক্ট০.০৪ কেজি) ও খামারী এলাকায় বাচ্চার জন্ম ওজন (১.৩৯ক্ট০.০৩) প্রায় কাছাকাছি। এক সাথে জন্মগ্রহণকারী বাচ্চার সংখ্যা গবেষণা খামারের (১.৫৪ক্ট০.২৪) চেয়ে খামারী পর্যায়ে (১.৩৩ক্ট০.১৭) সামান্য কম। বিভিন্ন বয়সে যেমন: ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৯ম মাস বয়সী বাচ্চার ওজন গবেষণা খামার ও খামারী এলাকায় প্রায় সমান। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ওজন খামারী এলাকায় (২৩.৩৭ কেজি) গবেষণা খামারের চেয়ে বেশী (২০.৮২)। প্রকল্পের শুরুতে খামারী এলাকায় সরবরাহকৃত ভেড়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ যা বেড়ে বর্তমানে ১০০ তে উন্নীত হয়েছে এবং এর সাথে সাথে খামারীদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমতল ভূমিতে পালিত ভেড়া পাহাড়ী এলাকায় খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে ।

গবেষণার নামঃহিলি মুরগীর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

হিলি মুরগী বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকা বিশেষ করে বান্দরবান জেলায় পাওয়া যায়। এসব মুরগির ডিম ও মাংস অতি সুস্বাদু হওয়ায় স্থানীয়ভাবে এসব মুরগী খুবই জনপ্রিয় এবং স্থানীয় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এসব মুরগি অন্যান্য বিদেশী মুরগির তুলনায় ২-৩ গুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। আকারে দেশী মুরগীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এই দূর্লভ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ মুরগিকে সংরক্ষনের উদ্যোগ নেয় এবং অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ী মুরগি সংগ্রহ করে তাদের ডিম দ্বারা দেশীয় পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটিয়ে উক্ত বাচ্চাগুলো বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষম মাংসল জাতের একটি দেশীয় মুরগির জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করে। উক্ত গবেষনার ফলাফলে দেখা যায়, ৮ সপ্তাহে বয়সে দৈহিক ওজন ৫০০-৬০০ গ্রাম এবং ২.৮ কেজি খাদ্য খেয়ে ১ কেজি মাংস বৃদ্ধি পায়। মোরগের দৈহিক ওজন ৪০ সপ্তাহ বয়সে প্রায় ৩০০০-৩৫০০ গ্রাম হয়।

গবেষণার নামঃবোয়ার ও যমুনাপবড়ী ছাগলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন

ছাগল আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পুষ্টি সরবরাহ, আত্ম-কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। ছাগল দ্রুত প্রজননশীল এবং ইহা পালনে কম শ্রম লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান এবং সংসারের সচ্ছলতা আনয়ন সম্ভব। বাংলাদেশে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রাণিজ আমিষ (দুধ, মাংস, ডিম) অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই অতিরিক্ত দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে আমাদের দেশীয় ছাগলের পাশাপাশি বিদেশী জাতের ছাগল যেমনঃ বোয়ার ও যমুনাপাড়ী গবেষণামূলকভাবে বিএলআরআই-তে পালন করা হচ্ছে। এজন্য বিএলআরআই-তে ২০১৪

সাল হতে বোয়ার জাতের ছাগলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যমুনাপাড়ী ছাগলের জন্ম ওজন ১.৭৩ কেজি সে ক্ষেত্রে বোয়ার ছাগলের জন্ম ওজন ৩.৪০ কেজি। যমুনাপাড়ী ছাগল ৩ মাস বয়সে মায়ের দুধ ছাড়ে তখন ওজন ৭.৯ কেজি অথচ বোয়ার ছাগল ৩ মাস বয়সে মায়ের দুধ ছাড়ে তখন ইহার ওজন ১৮.৫ কেজি। উভয় ছাগলই ১২ মাস বয়সে প্রজনন উপযোগী হয়। উভয় ছাগলই গড়ে ২টি করে বাচ্চা দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক যমুনাপাড়ী (৪০.৫৭ কেজি) ছাগলের তুলনায় বোয়ার ছাগলের ওজন অনেক বেশী (৫২.৩৬ কেজি)। ৩ মাস পর্যন্ত বয়সে বোয়ার ছাগল দিনে ১৬৮ গ্রাম করে ওজন বাড়ে সেক্ষেত্রে যমুনাপাড়ী ছাগল ওজন বাড়ে দৈনিক ৭০ গ্রাম।

(ছ) প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরিক্ষণ বিভাগ

গবেষণার নামঃবিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার সম্বন্ধে খামারী প্রশিক্ষণের প্রভাব

খামারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ের খামারীরা কেমন উপকৃত হচ্ছে তা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। রংপুর, সিরাজগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম জেলার চারটি উপজেলার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূটিতে অংশকৃত মোট ২০০ দুগ্ধ খামারীকে সরাসরি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর খামারীদের দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন, আয় বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর দুগ্ধ উৎপাদন ৪৩.৭% এবং ঘাস উৎপাদন ৫১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক আয় ১৫৪৭৩৮.৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৬৯৩৮.৩ টাকা হয়েছে এবং বার্ষিক গৃহস্থালীয় খরচ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭৫২৮.২ টাকা থেকে ১১৯১৪৩.০ টাকা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রদেয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমের বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিটি সফলভাবে খামারীদের মাঝে সম্প্রসারিত হয়েছে।

গবেষণার নামঃবাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি নীতিমলালাসমূহের মূল্যায়ন এবং এর সুপারিশসমূহ

গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ও এর প্রয়োগের ব্যাপারে স্ট্যাকহোল্ডারদের মধ্যে যে, অসঙ্গতি আছে তা যাচাই করা। গবেষকগণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিভাগ হতে মোট ৩৭৭ জন সংশ্লিষ্ট স্ট্যাকহোল্ডারদের নিকট হতে সরাসরি প্রশ্নোত্তর ও পরিদর্শণের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি নীতিমালার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি উদঘাটিত হয় যেমন অধিকাংশ মাংশ বিক্রেতা (৮০%) আইন সর্ম্পকে সচেতন নন এবং আইন না মেনেই মাংশ প্রক্রিয়াজাত করেন, প্রাণিখাদ্যের মূল্য অপ্রত্যাশীতভাবে ওঠা নামা করা, নির্ধারিত মূল্যে মাংশ, ডিম ও দুধ বিক্রয় না করা, নিবন্ধনহীন খামারের আধিক্য (৩৬%) ইত্যাদি। গবেষকগণ আরও উল্লেখ করেন যে, ৫০% ডিলার ও পরিবেশকগণ বিদ্যমান নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত নন। এর কারণ স্বরূপ গবেষকগণ সচেতনতার অভাব, আইন প্রয়োগে শিথিলতাকে দায়ী করেন। যদি সংশ্লিষ্ট স্ট্যাকহোল্ডারদের যথাযথ উপায়ে সচেতন করা যায় এবং আইনের সঠিক প্রযোগ নিশ্চিত করা যায় তবে এ ধরণের অসঙ্গতি দূর করা সহ এ খাতে কাংক্ষিত উন্নতি করা সম্ভব বলে গবেষকগণ মতামত দেন।

(জ)আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ

গবেষণার নামঃ জীবন্ত মুরগীর বিপনন ও মূল্য বিশ্লেষণ

সাভার উপজেলা পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণনের একটি প্রধান এলাকা। গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি কুইনন্টাল দেশী মুরগীর উৎপাদন খরচ ৭,৩০০ টাকা যেখানে সোনালী ১৭,০৬৩ টাকা ও ব্রয়লার ৯,৪৮৮ টাকা এবং নেট আয় দেশী মুরগী ৫,১৮২ টাকা, সোনালী ৩,৭১৪ টাকা ও ব্রয়লার ১,১২৩ টাকা। গ্রামে মহিলারা বাড়তি আয় হিসাবে উন্মুক্ত বিচরণ পদ্ধতিতে ও কম খরচে দেশী মুরগী পালন করে। সাভার বাজারের চেয়ে ঢাকা সদরে ব্রয়লারের মূল্য উত্থান ও পতনের ঝুকি বেশী এবং দেশী মুরগীর ক্ষেত্রে মাঝারি। সুতরাং খামারীদের এ বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। যদি নিশ্চিত করা যায় প্রক্রিয়াজাতকৃত মুরগী হালাল, রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত, তাহলে ভোক্তাগণ সেটা গ্রহণে আগ্রহী। টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণনের জন্য প্রয়োজন- জীবমত্ম মুরগীর বিপণন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত রাখা, ''মিনি পোল্ট্রি প্রসেসিং প্ল্যান্ট'' গড়ে তুলা, প্রক্রিয়াজাতকৃত মুরগীর মাংসের গুনগতমান পরীক্ষা ও সনদ প্রদান, প্রক্রিয়াজাতকৃত বর্জ্য নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা ও জনসাধারণের মাঝে জীবন্ত মুরগী বিক্রি ও পরিবহনের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্ক সচেতনতা গড়ে তুলা।

(ঝ)মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প

গবেষণার নাম: মহিষ ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন এবং গর্ভধারণ হার নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা

মহিষের দুধ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় ২৪ হাজার মাত্রা উন্নত জাতের মেডিটেরিয়ান মূরাহ মহিষের হিমায়িত সিমেন বা বীজ সংগ্রহ করা হয় এবং মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ভূক্ত ১৩টি জেলার ৩৯টি উপজেলার মহিষ খামারীদেরকে কৃত্রিম প্রজনন এর আওতায় নিয়ে এসে এ পর্যমত্ম মাত্র ৩৯২টি মহিষকে কৃত্রিম প্রজনন করা সম্ভব হয়েছে এবং তা থেকে ৫২টি সংকর জাতের মহিষের বাচ্চা পাওয়া গেছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ার কারণ হচ্ছে মহিষ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে

রাতের বেলায় গরম হয়, গরম হওয়ার লক্ষসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং ঋতু ভিত্তিক প্রজনন চক্র। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বিএলআরআই মহিষ উন্নয়ণ গবেষণা খামারে কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ, ইস্ট্রাস-সিনক্রোনাইজেশন এর মাধ্যমে হরমোন প্রয়োগ করে একই সময়ে একাধিক মহিষকে গরম করে কৃত্রিম প্রজনন করার কৌশল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, হরমোন প্রয়োগ করলে (ইস্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশন) ৮০% মহিষ গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে তবে তাদের গর্ভধারণ হার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গরম হওয়া গাভীর তুলনায় কম (১৬.৬৭ % vs ৫০.৯১%)। এই পদ্ধতিতে মহিষের গর্ভধারণ হার বাড়ানোর জন্য গবেষণা কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। মহিষে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারলে সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

(ঞ)সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ, গবেষণা ২য় পর্যায়)

গবেষণার নামঃভেড়ার অন্ত:পরজীবীর বিরুদ্ধে হারবাল কৃমিনাশক উদ্ভাবন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রাথমিকভাবে ২০০ ভেড়ার উপর সম্পাদিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নিমপাতা, পানপাতা, আনারসের পাতা ও করলা প্রতিটির ৫০ গ্রাম ২০০ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে ব্লেন্ডিং করার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত রস প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩-১০ মিলিলিটার হিসেবে ১ বার খাওয়ানো হলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোল কৃমির বিরুদ্ধে কৃমিনাশক হিসেবে কার্যকর। এতে ভেড়ার মলে কৃমির ডিমের উপস্থিতি শতকরা ৬০-৭৫ ভাগ কমে যায়। তবে উল্লেখ্য যে, গবেষণাটি চলমান।

গবেষণার নামঃ পাট, তুলা ও দেশীয় ভেড়ার উল সহযোগে সুতা ও কাপড় উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

ভেড়ার পশম একটি সম্ভবনাময় উপজাত দ্রব্য যা সারাবিশ্বে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদন জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে । এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ প্রানিসম্পদ গবেষণা ইন্সিটিউট এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সিটিউট এর যৌথ উদ্যোগে সুতা ও বিভিন্ন বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভেড়ার পশম বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । এর ধারাবাহিকতায় ৩০% ভেড়ার পশম, ৩০% পাট এবং ৪০% তুলা মিছিয়ে রাসায়নিক পক্রিয়াজাতকরন করে সুতা তৈরি করা হয়েছে । পরবর্তীতে সেই সুতা ব্যাবহার করে হাতে বুনা তাত যন্ত্র দিয়ে শাল তৈরি করা হয়েছে । এরপর ২০% ভেড়ার পশম, ৩০% পাট এবং ৫০% তুলা মিছিয়ে রাসায়নিক পক্রিয়াজাতকরন করে সুতা তৈরি করা হয়েছে । পরবর্তীতে সেই সুতা দিয়ে টেক্সটাইল কারখানা থেকে প্যান্ট পিচ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ৫০% ভেড়ার পশম এবং ৫০% পাট মিশিয়ে কম্বল তৈরির কাজ চলছে ।

(ট)ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

গবেষণার নামঃ বাংলাদেশে হাওড় অঞ্চলে সমাজভিত্তিক ফডার চাষ মডেল ও ফডার সংরক্ষণ প্রযুক্তির উন্নয়ন

সারা বছর গো-খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাওড় তীরবর্তি এলাকায় সহজপ্রাপ্য স্থানীয় কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত ঘাসকে নিয়ে একটি আদর্শ ফডার উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবনের গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। সেখানকার কিছু খামারিকে বাছাই করে উচ্চফলনশীল ফডার চাষ করে তাদের গবাদিপশুকে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তাতে খুব ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। উৎপাদিত ঘাস খাওয়ানোয় দুধের উৎপাদন বেড়েছিল প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ। এছাড়াও, হাওড় এলাকায় ফডার উৎপাদনে রাসায়নিক সারের সাথে সাথে বিভিন্ন জৈব সারের উপযোগীতাও পরীক্ষণ করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, “বিএলআরআই নেপিয়ার-৩” ঘাসটির মোট উৎপাদন এবং তার পুষ্টিগত মান রাসায়নিক সার ও অন্যান্য জৈব সারের তুলনায় গোবর সার ব্যবহারে বেশী কার্যকরী ছিল।

গবেষণার নামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন লবণাক্ত মাটিতে বিভিন্ন জাতের উচ্চফলশীল ফডারের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা, তাদের উৎপাদন দক্ষতা ও পুষ্টিমান পরীক্ষণ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সবুজ ঘাস উৎপাদনের এই সমস্যাকে সামনে রেখেই বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষিরা জেলার তিনটি লবনাক্ত এলাকায় উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাতের ফডারের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা যাচাই করার জন্য একটি কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেক এলাকায় ৫ জন করে সর্বমোট ১৫ জন কৃষক বাছাই করে তাদেরকে বাছাইকৃত ৫ টি করে ফডারের জাত (বিএলআই-নেপিয়ার ১, ২, ৩ জার্মান এবং পারা ঘাস) চাষ করতে দেয়া হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে যে, লবনাক্ত পরিবেশে বিভিন্ন জাতের ফডারের বেঁচে থাকার সক্ষমতায় তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে এবং অন্যান্য লবনাক্ত সহিঞ্চু ফডারের তুলনায় বিএলআই-নেপিয়ার ৩ (হাইব্রীড) ভাল সক্ষমতা প্রদর্শণ করেছে।

গবেষণার নামঃ বাদামী রংয়ের ব্লাক বেঙ্গাল ছাগলের বাড়ন্ত বাচ্চাকে বিভিন্ন জাতের উচ্চফলনশীল ফডার খাইয়ে তাদের দৈহিক বৃদ্ধিপরীক্ষণ

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাণীর ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণে অধিক উৎপাদনশীল ফডার সরবরাহ করার লক্ষ্যে বিএলআরআইর আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবানে ১৬ টি বাড়ন্ত বাদামী রঙের ব্লাক বেঙ্গাল ছাগলের বাচ্চাকে বিএলআরআইর উচ্চফলনশীল ফডারের সাথে ৪ প্রকারের খাদ্য খাইয়ে তাদের দৈহিক বৃদ্ধির প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একটি গবেষণা করা

হয়েছে। গবেষণায় বিএলআরআই নেপিয়ার-৩, ৪, রোজী এবং প্রাকৃতিক উৎপাদিত ঘাস নামক যে চার প্রকারের ফডার খাওয়ানো হয়েছিল, তাতে ছাগলের বাচ্চার প্রত্যহ দৈহিক বৃদ্ধি এবং খাদ্য রুপান্তর দক্ষতায় তাৎপর্যপূর্ণ কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়নি এবং গড় দৈহিক বৃদ্ধি ছিল দিনে প্রায় ৫০ গ্রামের মত। সুতরাং সেখানে ছাগল পালনে উপরোক্ত ফডার গুলির যে কোনটিই চাষ করে খাওয়ানো যেতে পারে।

গবেষণার নামঃ বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ ঘাস উৎপাদনে বিভিন্ন জৈব সারের প্রভাব এবং ঘাস ও ধান উৎপাদনের তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

বাঘাবাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম একটি দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে ডেয়রী শিল্পের জন্য প্রচুর কাঁচাঘাসের চাহিদা রয়েছে। তথাকথিত গো-চারণ ভূমি দিন দিন কমে যাওয়ায়, সেখানে উৎপাদিত কাঁচা ঘাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে উচ্চফলনশীল ফসলের জন্য সেখানকার খামারিরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে, বিধায় মাটির উর্বরতা শক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এই সমস্যা মোকাবেলা করে মাটির উর্বরতা শক্তি ফিরে পেতে জৈব সার ব্যবহার অত্যাবশ্যক। সুতরাং বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ ঘাস উৎপাদনে বিভিন্ন জৈব সারের প্রভাব এবং ঘাস ও ধান উৎপাদনের তুলনামূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ ঘাস উৎপাদন দক্ষতার মাপকাঠিতে জৈব সার গুলির পর্যায়ক্রমিক মান বা অবস্থান হচ্ছে প্রথমে লেয়ার লিটার এরপর পর্যায়ক্রমে বায়োগ্যাস স্লারি, ব্রয়লার লিটার এবং সবশেষে রাসায়নিক সার এবং সেই সাথে লাভ-লোকশান বিবেচনায় ধানের চেয়ে ফডার উৎপাদনই অধিক লাভজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

গবেষণার নাম: হাইড্রোপনিক, টিস্যু কালচার এবং আরপিডি মার্কারের মাধ্যেম বিভিন্ন জাতের ফডারের লবণাক্ত সহিষ্ণুতা যাচাই ও কৌলিক দূরত্ব নির্ণয়

বাংলাদেশে নেপিয়ার ঘাস একটি উচ্চ ফলনশীল বহুবর্ষজীবি ফডার, তাই ঘাসের মধ্যমমান থেকে অধিক লবনাক্ত সহিষ্ণুতা জাতে উন্নয়নে ব্যাপক গবেষণা প্রযোজন। লবনাক্ত সহিষ্ণুতা ফডারের জাত উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ভাবে তিন প্রকারের গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে; (১) হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন জাতের ফডারের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা যাচাই, (২) জিন স্থানান্তরিত করার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ফডার পুনরুৎপাদন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, এবং (৩) বিভিন্ন প্রকার নেপিয়ার ঘাসের মধ্যে কৌলিক দূরতব নির্ণয়। প্রাথমিক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে যে, হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ৭ ডিএস/মি (লবনাক্ততা) পর্যন্ত পাঁচটি ফডার যেমন- বিএলআরআই ১, ২, ৩, ৪ ও স্প্লেনডিডা এর মধ্যে বিএলআরআই ৩ ও ৪ লবনাক্ত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছে। তাছাড়া টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে পুনরু উৎপাদনের জন্য এমএস মিডিয়ামে ২ ও ৪ মিলিগ্রাম/ লিটার 2, 4-D হরমোন এর সাথে ৫ শতাংশ নারকেল পানি মিশ্রনে পাতা ও নোড ভাল কেলাস প্রদর্শন করেছে এবং বিএলআরআই নয় জাতের নেপিয়ার ঘাসের মধ্যে কৌলিক দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নয়টি ফডার জাত দুইটি প্রধান কস্লাস্টারে বিভিক্ত এবং গড় কৌলিক সম্পর্ক ৪৬.০। কস্লাস্টার-১ এ বিএলআরআই ১, ২ এবং কস্লাস্টার-২ এ বিএলআরআই ৩, ৪, মারকেরন, রোকউনা, নেপিয়ার হাইব্রীড, ডুয়ার্ফ আর্লি এবং ডুয়ার্ফ লেট অবস্থান করছে।

(ঠ) বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প

গবেষণার নামঃ বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ভাইরাসের প্রকোপ ও বিস্তার

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আক্রান্ত গরুর নমুনায় ক্ষুরারোগ ভাইরাস টাইপিং করে দেশে এ পর্যন্ত ৩ টি টাইপ (O, A ও Asia-1) সনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষায় ফলাফলে দেখা গেছে, ৩১% O টাইপ, ৭% A টাইপ, ৩১% Asia-1 এবং অবশিষ্ট৩১% নমুনায় ক্ষুরারোগের মিশ্র সংক্রমণ সনাক্ত করা হয়েছে। জিন ব্যাংকের ডাটার সাথে বাংলাদেশের ক্ষুরারোগের ভাইরাসের সিকোয়েন্স পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের ভাইরাস যা ৯৫-১০০ ভাগ পর্যন্ত সাদৃশ্য রয়েছে। দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্বে ক্ষুরারোগের প্রাদূর্ভাব তুলনামূলক ভাবে বেশী লক্ষ্য করা গেছে, যার অন্যতম কারন দেশে পশু চলাচল বৃদ্ধি পাওয়া।